ওগগরভত্তা এবং তারপরঃ বাংলাদেশের কবিতা

শর্মিষ্ঠা নিয়োগী, বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপঃ - বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা বাংলা সাহিত্যের একটি বড়ো অংশ। একটু নজর করলে দেখা যায় তার সঙ্গে সেই প্রাচীন কাল থেকেই খাদ্যরসিক বাঙালির বিশেষ পরিচয়টিও সমান্তরাল ভাবে প্রবহমান। 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'মঙ্গলকাব্য' পেরিয়ে সেই বহমানতা সমকালীন বাংলা সাহিত্যেও দেখতে পাই। সেই দর্শন থেকে উপলব্ধ হয় যে ভাত ছাড়া খাদ্যরসিক বাঙালির পরিচয় অসম্পূর্ণ। ভেতো বাঙালির সেই পরিচয়টিকে সবিশেষ অনুধাবন করতে গিয়ে দেখি প্রাচীন বাঙালি সমাজে বর্ণবিভেদ এত প্রবল ছিল যে অনেকদিন পর্যন্ত নিম্ন বর্ণের অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের ভাতের অধিকার ছিলনা। যে বর্ণ বিভেদ প্রথা একদিন প্রান্তবাসী বাঙালিকে ভাতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল সেই বর্ণবিভেদ প্রথা আধুনিক বাঙালি সমাজে না থাকলেও বঞ্চনার ছবিটি কিন্তু বদলায়নি। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ক্ষমতার রাজনীতি কেড়ে নিয়েছে সাধারণ মানুষের ভাতের অধিকার। সেই কারণে বাঙালি জীবনে 'ভাত' শুধুমাত্র খাদ্যতালিকার প্রথম নাম হয়ে থাকেনা আর, হয়ে ওঠে বাঙালির অস্তিত্বের প্রতীক- এই নিবন্ধ তারই আলেখ্য।

সূচক শব্দ- দলিত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আড়তদার, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষিক রাষ্ট্র, কৃত্তিম দুর্ভিক্ষ, আওয়ামী লিগ, রাষ্ট্র শাসন, রোমান্টিক মানসপ্রবণতা, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, শ্রেণিসংগ্রাম, প্রতীক।

বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা কথা বলেন তখন বিস্ময় জাগে এটা ভেবে যে রাজনীতি বা সংস্কৃতির পাশাপাশি খাদ্যরসিক বাঙালির একটা বিশেষ পরিচয় সেই প্রাচীন কাল থেকেই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। চর্যাপদের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদে আমরা পেলাম বাড়িতে অতিথি এলে তাকে ভাত দেওয়ার প্রথা এবং তার মধ্যেই গৃহস্থের সম্মানের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন- **"হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেসী"**('চর্যাপদ', অতীন্দ্র মজুমদার, নয়াপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৩৪)। অথচ বাঙালি সমাজে অনেকদিন পর্যন্ত ভাতের অধিকার সকলের ছিলনা। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ তাঁর 'বাংলা, বাঙালী ও বাঙ্গালীত্ব' গ্রন্থে জানিয়েছেন – "প্রকৃত পক্ষে সেকালের কোনো কিছুরই সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার উপায় নেই। ….. আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রও সেই খণ্ডরূপ। এক অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের সংস্কৃতিও এক হয়নি, হতে

পারেনি। সমাজে নানারকম ভেদাভেদ ছিল। .... ধর্মভেদ ছিল। জাতিভেদ ছিল। অধিকারভেদ ছিল। .... তাঁর প্রমাণ .... যারা চন্ডাল, যারা ছোটোলোক, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য তারা গ্রামের মধ্যে বাস করতে পারবেনা। গ্রামের বাইরে বাস করবে। দুইনম্বর, তারা পুরো চালের ভাত রেঁধে খেতে পারবেনা, উচ্ছিষ্ট খাবে, যদি উচ্ছিষ্ট না পায় তবে তারা ক্ষুদ রেঁধে খেতে পারবে। ভাত রেঁধে খেতে পারবেনা।" ('বাংলা, বাঙালী ও বাঙ্গালীত্ব', আহমদ শরীফ, অনন্যা, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা, আগস্ট, ২০১২, পৃঃ ৭৭)। চর্যাপদে অন্ত্যজ ডোমরমণীর গৃহে দেখি নিত্য অতিথির আগমন অথচ ভাতের সংস্থান নেই। সেখানে দেখি অন্ত্যজ মানুষের অধিকার আছে কিন্তু আর্থিক পরিস্থিতি নেই। মধ্যযুগে প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য, চতুর্দশ শতকে পিঙ্গল কতৃক সংকলিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্থে খাদ্যরসিক বাঙালিকে আরেকটু ভালোভাবে পরিচিত করালো যে বিখ্যাত পদটি সেটি হ'ল –

- **"ওগগরভত্তা**
- **রম্ভঅ পত্তা।**
- **গাইকো ঘিত্তা**
- **দুগ্ধ সযুত্তা।**
- **মোইলি মচ্ছা**
- **নালিচ গচ্ছা।**
- **দিক্কই কন্তা**

খাঅ পুনবন্তা।।" ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'- ১ম খণ্ড, শ্রী সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৯, পৃঃ ৫০)- গরম ভাত কলা পাতায় বেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আছে গাওয়া ঘি, সুস্বাদু দুধ, মৌরলা মাছ এবং পাট শাক। কান্তার রান্না পরিবেশনে স্বামী নিজেকে পুণ্যবান মনে করেছেন। ঘর গৃহস্থালির একটি পরিপাটি ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। বাঙালি তাহলে সেই প্রাচীনকাল থেকেই ভাতের মধ্যেই বেঁচে থাকার সার্থকতা খোঁজে। আদি মধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও স্বামী আইহনের জন্য রাধার রন্ধনের যে তালিকা বড়ু চন্ডীদাস পাঠকের কাছে পেশ করেছেন তাতেও ভাতই প্রধান খাদ্য, রাধা কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে এতই উতলা হয়েছে যে – **"বিণি জলে চড়াইলো চাউল"**('বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃঃ ৩৬৪)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ভরকেন্দ্র তার মঙ্গলকাব্য গুলি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত

চন্ডীমঙ্গল(অভয়ামঙ্গল)-এ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশেও ভাতের জন্য ক্রন্দনরত শিশুর পরিচয় ধরা আছে- **"শিশু কান্দে ওদনের তরে"**('কবিকঙ্কণ চন্ডী'- ১ম খণ্ড, সম্পাদনা ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৪)। এই কাব্যেরই 'শিবের ভিক্ষা' অংশে দেখি কোচ বধূর সংসারেও অন্নের প্রাচুর্য, ভিক্ষারত শিবের ডম্বরু শৃঙ্গার শব্দে সে বেরিয়ে এসে থালা ভর্তি 'চাউল' প্রদান করে এবং শিব – **"থাল হৈতে চাউলগুলি / পূরিয়া এড়েন ঝুলি"**('কবিকঙ্কণ চন্ডী'- ১ম খণ্ড, সম্পাদনা ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ৯৫)। কিন্তু প্রচুর ভিক্ষা অর্জন করেও শিবের সংসারের অন্নাভাব ঘোচেনা। শিবের আক্ষেপ তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে – **"কত ঘরে আনি/ লেখা নাহি জানি/ ডেরি অন্ন নাহি থাকে"**('কবিকঙ্কণ চন্ডী'- ১ম খণ্ড, সম্পাদনা ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ৯৮)। মুকুন্দরাম বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে বড় যত্নে চিত্রিত করেছেন, যার জন্য বাঙালির খাদ্যাভাসের বিস্তৃত বিবরণ আছে তাঁর কাব্যে এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রন্ধন তালিকার প্রথমেই আছে ভাতের প্রসঙ্গ। 'নিদয়ার সাধ' অংশেও **"ওদন ব্যঞ্জন জল"** দিয়ে সাধভক্ষণের বিশেষ খাদ্যতালিকার পরিচয় দিতে শুরু করেছেন কবি ('কবিকঙ্কণ চন্ডী'- ১ম খণ্ড, সম্পাদনা ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ১২৫)। অপরদিকে দলিত, প্রান্তবাসী মানুষের প্রতিনিধি ফুল্লরাকে দেখি ভাতের জন্য মাটির পাথর বাটি বন্ধক দিতে- **"চাউল সেরে বান্ধা দিল মাটিয়া পাথরা"**, সেই ভাতটুকুও যখন ফুরিয়ে যায় তখন তাকে যে শুধুমাত্র পান্তাভাতের জল খেয়ে কাটাতে হয় তার প্রমাণ হিসেবে সে বলে- **"আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান"** ('কবিকঙ্কণ চন্ডী'- ১ম খণ্ড, সম্পাদনা ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ১৭২)। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ লিখেছিলেন তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য। সেখানেও শিবের কাছে মনসা তাঁর পুজো সর্বজনগ্রাহ্য হবার বর চাইলে শিব তাঁকে জানান বারোমাসই তাঁর পুজো করবে 'দেব সুর নর'। কোন মাসে কীভাবে তাঁর পুজো হবে সেই আচরণের কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান – কার্ত্তিক মাসের পুজোয় – **"আতব তন্ডুল রম্ভা নানা আয়োজন"** হবে ('কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল', অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, কলকাতা, নাগপঞ্চমী, ১৩৮৪, পৃঃ ২৬)। আরেকটু আধুনিকের পথে এগিয়ে গিয়ে অন্নদামঙ্গলে পাই ইশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা **"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"**('ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪০৪, পৃঃ ২০৩)।

আমাদের এই সুজলা, সুফলা, সুবিশাল অখণ্ড বাংলা যেদিন ইংরেজের কূটনৈতিক কৌশলে স্বরাজের নামে অন্নহীন হয়ে গেল, সেদিন দুইবাংলার কবি নজরুলের আক্ষেপে ধরা পড়লো ভাত শুধু খাদ্যরসিক বাঙালির প্রধান খাদ্য নয়, ভাত মানে তার বেঁচে থাকা, তার অস্তিত্ব-

"ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন

বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।"('আমার কৈফিয়ত', নজরুল ইসলাম)। সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আমার কৈফিয়ৎ' লেখা হয়েছিল ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তার অভিঘাত এসে পড়ে আমাদের দেশেও। সেই সময় কালোবাজারি অন্নাভাব যে সাধারণ মানুষকে কত অসহায় এবং অপরিসীম কষ্টের জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিল সেই বিষয় নিয়ে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন তাঁর 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ফ্যান' কবিতায় ক্ষুধার্ত মানুষের পরিচয় এই রকম-

"অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,

ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান,

মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ!" ('ফ্যান', প্রেমেন্দ্র মিত্র)

কোটি কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে কেবল ভারতবর্ষেই প্রায় কুড়ি কোটি মানুষ আধবেলা খেতে পায়। দুবেলা ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা তাদের কাছে স্বপ্নবিলাস। শুধু শস্যের অপ্রতুলতা এর কারণ নয়, মাঠ থেকে খামার হয়ে আড়তদারের গোলায় পৌঁছনো অবধি ফসলের পরিক্রমণের পিছনেও থাকে ক্ষমতার রাজনীতি। তাঁর দাপটে তৈরি হয় নিরন্ন মুখ। পঞ্চাশের দশকের খ্যাতনামা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই নিরন্ন মানুষের হয়ে কলম ধরেছিলেন তাঁর 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' কাব্যগ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)। যত ক্ষীণই হোক না কেন, প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছিল তাঁর কলমের মুখে -

"অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার

অন্ন আদি অন্ন অন্ত্য অন্নই ওংকার।

সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাঁকে কাড়ে

ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, তারে।" ('অন্নদেবতা', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

আর, যেসব মানুষেরা কোনোভাবে এই ঘৃণ্য চক্রান্তের হাত থেকে বেঁচে গেছে তারা সারারাত প্রার্থনায় থাকে। ভাতের প্রার্থনায়। সে প্রার্থনায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ভাত ফুটে ওঠার গন্ধ –

“আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে

কারা যেন আজো ভাত রাঁধে

ভাত বাড়ে, ভাত খায়

আর আমরা সারারাত জেগে থাকি

আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,

প্রার্থনায়, সারা রাত ।” (আশ্চর্য ভাতের গন্ধ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং উল্লেখযোগ্য কবি রফিক আজাদ লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘ভাত দে হারামজাদা’। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি বিশেষ ভাষিক রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পেলেও তার স্বাধীনতা লাভের সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশে কৃত্তিম দুর্ভিক্ষ তৈরি হ’ল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, পরাধীনতা থেকে মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা সাধারণ বাঙালি জীবনে নেমে এলো খাদ্যাভাব। চারিদিকে খাদ্যের জন্য হাহাকার। বাংলাদেশের আরেক মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকির ভাষায়- “তখন সারাদেশে এক অস্থিতিশীল অবস্থা। পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের কাছে নিদারুণ ভাবে হেরেছিল। …. যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশে অভাব তো ছিলই পাটের গুদামে আগুন, কলকারখানা ধ্বংস, আওয়ামী লিগ নেতাদের গুপ্তহত্যা” (মোঃ আবু রায়হান, ‘ভাত দে হারামজাদা’ – কবির মৃত্যুদিবস ও কবিতার প্রভাব, The Daily Campus(e-journal), ১২.০৩.২০২০)- এরই প্রেক্ষিতে মানুষের অসৎ প্রয়াসে তৈরি হ’ল দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ মানুষের আর্তনাদ কবি রফিক আজাদ কে এতটাই নাড়িয়েছিল যে তিনি রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশ করে লিখেছিলেন ‘ভাত দে হারামজাদা’-র মতো সাড়া জাগানো কবিতা। যে স্বাধীন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় অন্নের সংস্থান করতে পারেনা সেই স্বাধীনতা যে কতো অর্থহীন এই বাস্তবসত্য কে তিনি শাসকগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়-

“আমার সামান্য দাবি পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর –

ভাত চাই- এই চাওয়া সরাসরি – ঠাণ্ডা বা গরম

সরু বা দারুণ মোটা রেশনের চাল হলে

কোনো ক্ষতি নেই – মাটির শানকি ভর্তি ভাত চাইঃ” (‘ভাত দে হারামজাদা’, রফিক আজাদ)

সাধারণ মানুষের এই ন্যায্য দাবি পূরণে শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা দেখা গেলে কী পরিণতি হবে তাঁর ইঙ্গিতও কবি দিয়েছেন তাঁর কবিতায়-

“যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবি

তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কান্ড ঘটে যাবে

ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট আইন-কানুন –

সম্মুখ যা কিছু পাবো খেয়ে যাব অবলীলাক্রমেঃ

থাকবেনা কিছু বাকি – চলে যাবে হাভাতের গ্রাসে।” (‘ভাত দে হারামজাদা’, রফিক আজাদ)

ক্ষুধাতুর শিশু যেমন তাঁর মায়ের কাছে অনবরত ভাত চাইতে চাইতে না পেয়ে অসহায় আক্রোশের বশে মায়ের প্রতি যাবতীয় রাগ, ক্রোধ বর্ষণ করে, কখনো কখনো মা কে আক্রমণ করে বসে, কবিও ঠিক সেই অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন দ্বিধাহীন ভাষায়-

“যদি বা দৈবাৎ সম্মুখে তোমাকে ধরো পেয়ে যাই -

রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে উপাদেয় উপাচার হবে।

সর্বপরিবেশগ্রাসী হ’লে সামান্য ভাতের ক্ষুধা

ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।” (‘ভাত দে হারামজাদা’, রফিক আজাদ)

এবং তারপরেই তাঁর আক্রোশ ক্রমশ তীব্রতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে –

“দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অবধি ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে

অবশেষে যথাক্রমে খাবোঃ গাছপালা, নদী-নালা

গ্রামগঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত

চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব প্রধান নারী

উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ী

আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ

ভাত দে হারামজাদা,

তা না হলে মানচিত্র খাবো।”(‘ভাত দে হারামজাদা’, রফিক আজাদ)

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে স্বাধীনতা নয়, সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার এবং দাবিই যে প্রাধান্য লাভ করে তা নজরুলের কবিতায় যেমন পেয়েছি, এখানেও দেখি প্রায় অর্ধশতাব্দী পার করেও ক্ষুধার্ত মানুষের একমুঠো ভাতের দাবিতে রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার বিষয়টি।

ষাটের দশকের বাংলাদেশের অন্যতম কবি মহাদেব সাহার কবিতাতেও দেখি রোমান্টিক মানসপ্রবণতার পাশাপাশি সমকালের ঘটনাবলী, নৈতিকতা, আনন্দ, বিষাদ ও কাতরতার আর্তি পরিস্ফুট। তাঁর 'ধুলোমাটির মানুষ' কাব্যগ্রন্থের 'জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও অধিকার নিয়ে তাঁর উচ্চারণ –

"কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একজন

কবির

মনু মিয়াঁর হাঁড়ির খবর ভুললে চলেনা,

আমি তাই চোয়ালভাঙা হারু শেখের দিকে

তাকিয়ে

আন্তর্জাতিক শোষণের কথাই ভাবি,

পেটে খিদে এখন বুঝি কবিতার জন্য কি

অপরিহার্য

জুঁইফুলের চেয়ে কবিতার বিষয় হিসেবে আমার

কাছে

তাই

শাদা ভাতই অধিক জীবন্ত – আর এই ধুলোমাটির

মানুষ" ('জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর' – মহাদেব সাহা)

আমরা বাংলা কবিতার পাঠক বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখি শুধুমাত্র একটি সমাসোক্তি অলংকার প্রয়োগে মানুষ ও শাদা ভাত কীভাবে সমার্থক হয়ে যায়! বেঁচে থাকার দুর্মর বাসনা, প্রবল হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর নিজের অধিকারটুকু নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাওয়া মানুষের প্রতীক হ'ল শাদা ভাত। রফিক আজাদ তাঁর 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতায় নিরন্ন মানুষের জন্য প্রধান ও প্রাথমিক দাবিতে সোচ্চার হয়ে জানিয়েছেন –

"দুবেলা দুমুঠো পেলে ছেড়ে দেবো অন্য সব দাবী;

অযৌক্তিক লোভ নেই, এমন কি নেই যৌন ক্ষুধা

চাইনিতোঃ নাভি নিম্নে পরা শাড়ি, শাড়ির মালিক;

যে চায় সে নিয়ে যাক – যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দাও

জেনে রাখোঃ আমার ওসবের কোনো প্রয়োজন

নেই।" ('ভাত দে হারামজাদা', রফিক আজাদ)

এই পরিচিত ভঙ্গি দেখা যায় মহাদেব সাহার 'জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর' কবিতাতেও। সেখানে সমাজ ও বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কে সচেতন কবির ভাবনার কেন্দ্রে থাকে শোষিত, নিপীড়িত, সাধারণ মানুষ। তিনি বলেন –

"এই কবিতাটি তাই হেঁটে যায় অন্ধগলির নোংরা

বস্তিতে

হোটেলের নাচঘরের দিকে তাঁর কোনো আকর্ষণ

নেই" ('জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর'- মহাদেব সাহা)

সাধারণ, খেটে খাওয়া, বঞ্চিত মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলাই কবি মহাদেব সাহার লক্ষ্য –

"এই কবিতাটি কখনো একা একাই চলে যায়

অনাহারী

কৃষকের সঙ্গে

জরুরী আলাপ করার জন্য,

তার সঙ্গে কী তার এমন কথা হয় জানিনা

পর মুহূর্তেই দেখি সেই ক্ষুধার্ত কৃষক

শোষকের শস্যের গোলা লুঠ করতে জোট বেঁধে

দাঁড়িয়েছে;" ('জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর' – মহাদেব সাহা)

ক্ষুধার্ত কৃষকের শোষকগোষ্ঠীর শস্যভান্ডার লুঠ করার এই চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে এখানে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারা মানুষের জোটবদ্ধ প্রতিবাদের যে ছবি আঁকলেন কবি কবিতার ভরকেন্দ্র সেখানেই। সেই কারণে কবি বলেছেন – "এই কবিতার যদি কোনো সাফল্য থাকে তবে তা এখানেই"। সঙ্গত কারণেই তাঁর কবিতা ভাষা পেয়ে যায় এইভাবে –

"তাই এই কবিতার অক্ষরগুলো লাল, সঙ্গত

কারণেই লাল

আর কোনো রঙ তাঁর হতেই পারেনা-

অন্য কোনো বিষয়ও নয়

তাই আর কতোবার বলবো জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা

ভাতই

অধিক সুন্দর"('জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর' – মহাদেব সাহা)

২০১৮ তে প্রকাশিত 'বেলাশেষের রঙ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ভাত' কবিতাতেও সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের কবি খলিলুর রহমানও ভাত আর মানুষের অস্তিত্বকে এক করে দেখেছেন-

"চিনিনাকো দেশ জানিনাকো স্বাধীনতা

বুঝিনাক বাদ-তন্ত্র-মন্ত্র-কথা।

শুধু চিনি আমি কোনটা ভাতের হাঁড়ি

যা ভরাতে আমি প্রতিদিন ঘর ছাড়ি।" ('ভাত', খলিলুর রহমান)

এই ঘর ছাড়ার বিষয়টি যেন সেই রফিক আজাদের কবিতায় – " তা না হলে মানচিত্র খাবো" কথাটির অর্থ স্পষ্ট করে দেয়।

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'ধুলোমাটির মানুষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর' কবিতায় কবি মহাদেব সাহা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বহারার শ্রেণি সংগ্রামের যে ছবিটি এঁকেছেন, যা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় তেভাগা আন্দোলনের কথা, আমাদের শ্রেণি সংগ্রামের অতীত ইতিহাসকে ফিরে পড়তে ইঙ্গিত করে যেমন তেমনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের মহিলা কবি সেলিনা জাহান প্রিয়া যখন ২০১৫ সালে লেখা তাঁর 'সাদা ভাতের গন্ধ পাই' কবিতায় বলেন-

"ভাতের গন্ধে মানুষের স্বপ্ন হাসে

ভাতের গন্ধে মানুষ বিপ্লবী হয়

ভাতের গন্ধে মানুষ পুনরায় জেগে ঊঠে" – ('সাদা ভাতের গন্ধ পাই', সেলিনা জাহান প্রিয়া)

তখন বোঝা যায় সময় এগিয়ে গেলেও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সামাজিক অবস্থান খুব পরিবর্তিত হয়নি ব'লেই সমাজে এই সমস্যা একইরকম ভাবে বিদ্যমান। কবিতার শেষ অংশে সেলিনা যখন বলেন –

"ক্ষুধার্তের ধর্ম একমুঠো ভাত। ভাত দে মা ভাত দে

তুই হ মা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান, আমি ক্ষুধার্ত মা

আমাকে ভাত দে! আমি সাদা ভাতের গন্ধ পাই" ('সাদা ভাতের গন্ধ পাই', সেলিনা জাহান প্রিয়া)

তখন আর শুধু মানুষের অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে থাকেনা ভাত, মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। 'চর্যাপদ', অতীন্দ্র মজুমদার, নয়াপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮

২। 'বাংলা, বাঙালী ও বাঙ্গালীত্ব', আহমদ শরীফ, অনন্যা, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা, আগস্ট, ২০১২,

৩। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'- ১ম খণ্ড, শ্রী সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৯,

৪। 'বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৬

৫। 'কবিকঙ্কণ চন্ডী'- ১ম খণ্ড, সম্পাদনা ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৬। 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল', অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, কলকাতা, নাগপঞ্চমী, ১৩৮৪

৭। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪০৪

৮। সঞ্চিতা, নজরুল ইসলাম, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, মাঘ, ১৩৭৯

৯। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিতেড, কলকাতা, ৮মে ১৯৮৯

১০। বীরেন্দ্র সমগ্র – ১ম খন্ড, পুলক চন্দ ও সব্যসাচী দেব সম্পাদিত, অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

১১। বাংলাদেশের কবিতাগুলির পাঠ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে।